দশ কথা

সা ক্ষা ৎ কা র

দশ কথা

বিশিষ্টজনের মুখোমুখি

অ লা ত এ হ্ সা ন

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-97980-1-9

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

দ শ ক থা
বিশিষ্টজনের মুখোমুখি
অলাত এহ্সান

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ উপলক্ষে মুদ্রিত
কপিরাইট © অলাত এহ্সান
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
প্রতিকৃতি : রাফাত আহমেদ বাঁধন
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৪৯০ টাকা

Dosh Kotha
by Alat Ehsan

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by Alat Ehsan
Illustrations Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

উ ৎ স র্গ

এ শহরে যে তিনজনের ‘তিরস্কার’
আমি নিঃশর্ত মেনে নিই

দিলওয়ার হাসান
গুরু গল্পকার, অনুবাদক

ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ
অনুবাদক, প্রকাশক

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম
গল্পকার, বৃক্ষের আশ্রয়

ভূমিকা

মানুষ অন্যের হাঁড়ির খবর জানতে চায়; পাড়া-পড়শির, সহকর্মীর, আত্মীয়-স্বজনের, বন্ধু-বান্ধবের, নেতা-নেত্রীর, বিখ্যাত ব্যক্তিদের—কার নয়? দরজা খোলা থাকলে সন্তও একবার তাকিয়ে দেখতে চায় কামরার ভেতরে কী আছে। মানুষ জানতে চায় এরপর কী হলো, তারপর কী হলো, যে-কারণেই না আরব্য রজনীর উজিরকন্যা শাহেরজাদি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল; কারণ মানুষের এই যে চিরন্তন প্রবণতা, এটাই সে উসকে দিয়েছিল তার স্বামী শাহরিয়ারের মধ্যে, যে কিনা—আরব্য রজনীর কল্যাণে আমরা জানি—তার দেখা কিছু নারীর অবিশ্বস্ততার কারণে নারীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিয়ের রাত পোহালে নববধূকে কতল করত; কিন্তু শাহেরজাদিকে বিয়ে করার পর প্রথম রাতে এই নববধূ তাকে গল্প শোনাতে শুরু করে তবে শেষ করে না, ফলে কাহিনির শেষটা জানার জন্য স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় শাহরিয়ারকে। আর এভাবেই একের পর এক পৌনঃপুনিক ঘটনায় কেটে যায় এক হাজার এক রাত, রাজার মন থেকে দূর হয় নারীবিদ্বেষ, বেঁচে যায় শাহেরজাদি। কিন্তু কী পায় জেনে? কেন জানতে চায়? নিছক কৌতূহল নিবৃত্তি? নাকি জ্ঞানলাভ? তুলনা? পথের দিশা? যেকোনেটিই হতে পারে, বা একাধিক, বা এসবের সবকিছু, বা একবারেই অন্য কিছু। ব্যক্তিভেদে তা ভিন্ন হতেই পারে।

তবে শুধু মানুষের হাঁড়ির খবরই মানুষের একমাত্র জ্ঞাতব্য নয় অবশ্যই। তার আশপাশ, প্রকৃতি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, জীব-জন্তু তো বটেই, এসব ছাড়িয়ে দূর দূরান্তে, নিজ গ্রহ ছাড়িয়ে অসীম মহাকাশও তার জানার বিষয়। সেই দূর অনধিগম্য গ্রহে সে মানুষ বা যন্ত্র পাঠিয়ে খবর নিতে চায় সেখানের হাল-হকিকত কী, সেসব স্থানে কেউ বাস করে কিনা ইত্যাদি। কেউ বা কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়ে

গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে ভেবে নিতে চায় সেখানে মানুষ গেলে কেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, বা সেখানকার 'বুদ্ধিমান' প্রাণীরা পৃথিবীতে এলে কী কী ঘটতে পারে, সায়েন্স ফিকশনে যা বিধৃত আছে।

আর অতি অবশ্যই সে নিজেকেও জানতে চায়। হয়ত এত কিছু যে সে জানতে চায় বা এত কিছুর প্রতি তার যে কৌতূহল সেটা তার নিজেকে জানারই একটি উপায়; সমস্ত মানুষের, প্রকৃতির, আর ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তার নিজের অবস্থা ও অবস্থানকে জানার একটি হাতিয়ার। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।' আর বলা হয়ে থাকে সেই অতীব প্রাচীন কথাটি—'Know thyself.'

জানার এই অসম্ভাব্যতার সূত্রে চলে আসে দার্শনিক প্রসঙ্গ, যা যুগে যুগে চিন্তাশীল মানুষকে বিচলিত, আলোড়িত করেছে : আমাদের জানার দৌড় কতটুকু? আমরা যা জানছি তা কতটা নির্ভরযোগ্য? একই ঘটনা বা ফেনোমেনন (phenomenon) সম্পর্কে নানান জনের নানান মুনির নানান মত। 'রশোমন এফেক্ট'। তাহলে ভরসা কোথায়? সত্য কী? ফেনোমেনন সম্পর্কেই এই যদি অবস্থা, তাহলে নুমেনা (noumenon) বা প্রকৃত যে ঘটনা বা সারবস্তু, ঘটনার পেছনের ঘটনা, তার কী হবে? অধিবিদ্যা (metaphysics) কি তাহলে অনধিগম্য, যেমনটা বলেছিলেন অভিজ্ঞতাবাদীরা, বা কান্ট? নাকি হেগেলই ঠিক? আকাশের ওপারে আকাশ নেই আসলে। যা সামনে রয়েছে তা-ই আসল।

দার্শনিক এবং মনেবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস কৌতূহলক বা curiousity-কে বলেছিলেন—'the impulse towards better cognition' (বেহতর বোধের জন্য ঝোঁক), তার মানে, আমরা যা জানি না বলে মনে করি তা বোঝার ইচ্ছা। তিনি আরো বলেছেন, শিশুদের ক্ষেত্রে এই কৌতূহল বা ঝোঁকটিই তাদেরকে নতুন এবং রোমাঞ্চকর জিনিসের দিকে আকৃষ্ট করে বা তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তার মানে উজ্জ্বল, স্পষ্ট, প্রাণবন্ত আর চমকপ্রদ জিনিসের দিকে। আবার, ইংরেজিতেই একটা কথা আছে—'curiosity killed the cat', যার মর্মার্থ এই যে—অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়। কিন্তু মানুষের কৌতূহল আর মার্জার বা অন্যান্য প্রাণীর কৌতূহলের মধ্যে বোধ হয় একটা বড় ফারাক আছে। কোনো বিড়ালের বা জীব-জন্তুর পেছন থেকে একটা বল গড়িয়ে সেটার সামনে আস্তে ক'রে ছুড়ে দিলে বলটা কোথা থেকে এলো বা কে গড়িয়ে দিল

তা দেখার জন্য সেটা কিন্তু ফিরে তাকায় না, সামনে চলে আসা বলটার দিকেই সে ছুটে যায়। কিন্তু মানুষ পেছনে তাকিয়ে দেখে বলটা কোথা থেকে এলো, কে পাঠাল। তার মানে মানুষ ঘটনার কার্যকারণ, ইতিহাস জানতে চায়। পশুপাখি (সম্ভবত) তা জানতে চায় না, তারা বর্তমান নিয়েই সন্তুষ্ট। মানুষ তার অতীত, তার বর্তমান, এমনকি তার ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

এই অতিরিক্ত কৌতূহলের কারণে তাকে মূল্যও দিতে হয়েছে প্রচুর, কখনো কখনো বিড়ালটির মতোই নিজের প্রাণ দিয়ে, কখনো বা মান, সম্পদ বা শারীরিক ক্ষতি স্বীকার ক'রে। পুরাণ ও সাহিত্যে এই দুর্নিবার কৌতূহলের জন্যে মর্মন্তুদ মূল্য দেওয়া প্রথম মানুষটি কি ঈদিপাস? অনিবার কৌতূহলের কারণে মানুষ যা জানতে পেরেছে তার সাথে অযুতবার যখন সংঘাত বেঁধেছে সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্মের প্রচলিত বয়ানের, তার ওপর কি নেমে আসেনি চরম অত্যাচার? তাকে কি দিতে হয়নি প্রাণ ও মান? জিওর্দানো ব্রুনোর কথা মনে পড়বে, আসবেন গ্যালিলিও, এ-সূত্রে। আরো আছেন এন্তার, যাঁরা তাঁদের গবেষণার কাজ করতে গিয়ে, পর্বতারোহনে গিয়ে, জলে ডাঙায় অন্তরীক্ষে অভিযান চালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন, বিকলাঙ্গ হয়েছেন, শারীরিক অসুস্থতার শিকার হয়েছেন। কিন্তু এসব নিগ্রহ মানুষকে দমাতে পারেনি, এই কৌতূহলই তাকে আজকের অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তবে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তাদের শিশুকালে কৌতূহল থাকে অপার। তাই থাকে নানান প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। শিশু যত বড় হতে থাকে তার এসব কৌতূহল যেন মিইয়ে যেতে থাকে, সবকিছুকেই সে স্বাভাবিক, গতানুতিক বলে ধরে নেয়। দার্শনিক, বিজ্ঞানীরা এই কৌতূহল বাঁচিয়ে রাখেন জীবনভর।

তো লেখার শুরুতে যে 'হাঁড়ির খবর' এর কথা বলেছিলাম, তা জানার যত উপায় আছে তার মধ্যে সাক্ষাৎকার অন্যতম। বিশেষ কোনো প্রসঙ্গ, সমস্যা, কোনো সংকট বা সম্ভাবনা উপলক্ষে এসব সাক্ষাৎকার পাঠকের জন্য গ্রহণ করা হতে পারে, হতে পারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনালোচিত বা নাতি আলোচিত কোনো ব্যক্তিত্বের জীবন ও কাজ সাধারণ বা বিশেষ কোনো পাঠকগোষ্ঠীর জন্য। তবে, এর চল যে অর্বাচীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সাক্ষাৎকার বলতে যতটা না, সেটার ইংরেজি ইন্টারভিউ বললে প্রথমেই মনে আসে চাকরির জন্য 'ইন্টারভিউ'-র কথা। মজার ব্যাপার হলো, এই 'জব ইন্টারভিউ'-র আবিষ্কারক নাকি অসংখ্য আবিষ্কারের জনক

মেনলো পার্কের জাদুকর টমাস আলফা এডিসন। এই মাত্র সেদিন, একশ দুই বছর আগে, যে-বছর আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ১৯২১ সালে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান পরীক্ষা করেছিলেন।

আরো মজার বিষয় হচ্ছে, গবেষণা সহকারী নিয়োগ দেবার সময় তিনি তাদের সাক্ষাৎকার নেবার কালে তাদেরকে একবাটি স্যুপ দিতেন। সঙ্গে লবণ আর মরিচ। তিনি দেখতেন চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে কে সেই স্যুপে লবণ বা মরিচ নিচ্ছে। এর কারণ হল, তিনি মনে করতেন, যে মরিচ বা লবণ যোগ করছে সে ধরে নিচ্ছে স্যুপে যথেষ্ট লবণ বা মরিচ দেওয়া হয়নি। আর এডিসন মনে করতেন এ-ধরনের ধরে নেওয়া বা অনুমান করা উদ্ভাবন ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। ফলে সেরকম প্রার্থী বাদ পড়ে যেত। সাক্ষাৎকার গ্রহণের আরেক পদ্ধতির নাম 'প্রস্ত কোশ্চেনেয়ার' (Proust questannaire), উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটেনে 'অটোগ্রাফ বুক' বা 'কনফেশন অ্যালবাম বা কনফেশন বুক' নামে এক ধরনের বইয়ের বেশ চল ছিল, সেখানে আপনার প্রিয় রঙ, প্রিয় ফুল, প্রিয় পেশা, প্রিয় কবি, সুখ বলতে আপনি কী বোঝেন—এই ধরনের প্রশ্ন থাকত (যার সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত), আর সেসবের জবাব দেবার জন্য ডান পাশে জায়গা থাকত। আমেরিকা জার্মানি ফ্রান্সেও এ ধরনের বইয়ের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।

১৮৬৫ সালে কার্ল মার্ক্স এবং ১৮৬৮ সালে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসও এরকম 'কনফেশন অ্যালবাম'-এর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন নাকি। মার্ক্স উল্লেখ করেছিলেন তাঁর প্রিয় রঙ নীল আর এঙ্গেলস 'সুখ বলতে আপনি কী বোঝেন'—এই প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছিলেন শ্যাতো মার্গ-র কথা (Chateau Margaux)। আর বিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত, ১৮৮৬ সালে, তখন তিনি ১৪ বছরের কিশোর, Confessions. An Album to Record Thoughts, Feelings & c. শিরোনামের একটি ইংরেজি কনফেশন অ্যালবামের প্রশ্নের উত্তর লিখেছিলেন। এই অ্যালবামটি ২০০৩ সালে ৩৪ হাজার পাউন্ডে নিলাম হয়েছিল। ১৯৫০'র দিকে প্রুস্তের প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার সুবাদে প্রথমে ফ্রান্সে এবং পরে আমেরিকার টিভিতে এবং আরো পরে ১৯৮০ তে জার্মানির একটি পত্রিকার মাধ্যমে এবং ১৯৯৩ সালে ভ্যানিটি ফেয়ার সুবাদে প্রস্ত কোশ্চেনেয়ার নামে পরিচিতি লাভ করে, যেখানে সমাজের প্রথিতযশা লোকজনকে সেই গোড়ার দিককার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলা হতো।

ছাত্রদের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পড়াতে হয় ক্লাসে। সেই সূত্রে দ্য গ্রেট ফিলসফার্স নামের চমৎকার একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় ২৫ বছরেরও আগে। ব্রায়ান এডগার ম্যাগি (১৯৩০-২০০৯) নামের এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন দিকপালের জীবন ও কাজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের তথা সমসাময়িক দার্শনিকদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন বিবিসি টেলিভিশনের দ্য গ্রেট ফিলসফার্স নামেরই একটি অনুষ্ঠানের জন্য; সেটা ১৯৮৭ সালের কথা। সেই সিরিজে তিনি অন্যদের মধ্যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং দেকার্ত-এর দর্শন নিয়ে আলাপ করেছিলেন বিভিন্ন জনের সঙ্গে; এছাড়াও হেগেল ও মার্ক্স নিয়ে আলাপ করেছিলেন দার্শনিক পিটার সিঙ্গারের সাথে। সবশেষে ছিল ভিটগেনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ, মার্কিন দার্শনিক জান সার্ল-এর সঙ্গে। সমস্ত আলাপই দুই মলাটের মধ্যে গ্রথিত হয়েছিল। তার আগেও ব্রায়ান ম্যাগি এ ধরনের প্রকল্পে কাজ করেছিলেন বিশ শতকের দার্শনিকদের সঙ্গে এবং দর্শনকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে সেসব সাক্ষাৎকার বড় ভূমিকা রেখেছে।

বিল ময়ার্সের সঙ্গে পুরাণ নিয়ে জোসেফ ক্যাম্পবেলের সাক্ষাৎকার 'মিথের শক্তি'—যা বাংলায় খালিকুজ্জামানের অনন্য অনুবাদে বাংলাভাষীদের মন জয় করেছে, আর একই অনুবাদকের কলমে প্লিনিও আপুলিও মেন্দোজার নেওয়া ১৯৮২ সালের কলম্বীয় নোবেলজয়ী সাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর সাক্ষাৎকারভিত্তিক গ্রন্থ 'পেয়ারার সুবাস'। এছাড়াও আমরা পরিচিত ওরিয়ানা ফাল্লাচি নামটির সঙ্গে। ইতালির এই সাংবাদিক গত শতকের ছয়, সাত ও আটের দশকে বিশ্বের অসংখ্য নেতার 'long, aggressive and revealing interviews' গ্রহণের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। টেলিভিশনে (সিএনএন ইন্টারন্যাশনাল) আরেকটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান খুব বিখ্যাত ছিল : 'ল্যারি কিং লাইভ', যেখানে প্রতিনিয়ত নাস্তানাবুদ হতেন জগতের বহু বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্ব, ১৯৮৫ সালের ৩ জুন থেকে ২০১০ সালের ১৬ ডিসেম্বর অব্দি সপ্তাহে তিনদিন প্রচারিত এই অনুষ্ঠানটির পৃথিবীজুড়ে ছিল লক্ষ দর্শক। এ ধরনের আরো অনুষ্ঠান রয়েছে বা ছিল বলাই বাহুল্য।

আবার মনোবিশ্লেষক বা সাইকোএনালিস্টরা নেন অন্যরকমের সাক্ষাৎকার, রোগ নির্ণয়ের জন্য, যা ১৮৯০'র দশকে প্রচলন করেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের 'গুরু' জোসেফ বাওয়ার, তাঁর রোগী, নারীবাদী বার্থা

পাপেনহাইমের চিকিৎসাসূত্রে। এই পদ্ধতি 'টকিং কিওর' নামে পরিচিত।

আমরা দেখেছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকার নামে একটা অংশই থাকে, যেখানে নিয়মিতভাবে দেশ-বিদেশের নানান গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়ে থাকে। এমন কিছু বিখ্যাত পত্রিকা হচ্ছে প্যারিস রিভিউ, ইউনেস্কো কুরিয়ার ইত্যাদি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত বইভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা বইয়ের দেশ-এর প্রতি সংখ্যাতেও থাকে একজন বিশিষ্ট মানুষের সাক্ষাৎকার।

গল্পকার ও সাংবাদিক অলাত এহ্সানের 'দশ কথা : বিশিষ্টজনের মুখোমুখি' বইতে যে দশজন কৃতী মানুষের এগারোটি সাক্ষাৎকার সংকলিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সম্ভবত একজন ছাড়া বাকি দশজন কৃতী মানুষের সাক্ষাৎকার এর আগে নানান পত্র-পত্রিকায় বের হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেসব নানান বইয়ে সংকলিত বা গ্রথিত হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, লেখক, গবেষক, সংগঠক সন্‌জীদা খাতুনের সাক্ষাৎকারটি আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি; এবং এই গ্রন্থে সবচাইতে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি মনে হয় এটিই। এই সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে অলাত এহ্সানের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কবি এবং ছোটকাগজ *পূর্ব*-সম্পাদক রণজিৎ অধিকারী। সন্‌জীদা খাতুন কথা বলেছেন কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর বাবার বন্ধুত্ব, ঢাকায় কবিকে ঘিরে তাঁর স্মৃতি, বাবাকে নিয়ে পারিবারিক স্মৃতি, ছায়ানট গঠন, ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন, লেখালেখি, সংগীতের শুদ্ধচর্চা নিয়ে। কথোপকথনে এসেছে সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, সত্যেন সেনের স্মৃতি।

আর জাফর আলম, যাঁকে তাঁর নিজের কথা উদ্ধৃত ক'রে বলতে হয়—'কেউ লেখক বলেই মনে করেনি', তাঁর প্রথম আলোয় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি বোধ হয় একমাত্র সাক্ষাৎকার। এখানে অনুবাদের সাধারণ করণ-কৌশল এবং তাঁর নিজের অনুসরণ করা পথ সম্পর্কে কথা বলেছেন তিনি—'অনুবাদ তো কেবল ভাষার পরিবর্তন নয়, অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবের অনুবাদ তো একটি মৌলিক সমস্যা।' আরেক জায়গায় তিনি বলছেন—'আগে গল্প পড়ে আত্মস্থ করতে হবে, তারপর ভাবানুবাদ করতে হবে, যাতে পাঠকপ্রিয়তা পায়, পাঠকেরা বুঝতে পারে। মূল বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। আসলে পাঠক যদি না পড়ে তাহলে তো লাভ নেই।' অর্থাৎ তিনি তাঁর অনুবাদে সবচাইতে নজর

দেন পাঠযোগ্যতা এবং পাঠকের পড়ার ওপর।

এই সাক্ষাৎকার সংকলনে হাসান আজিজুল হক একমাত্র লেখক, যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহীতার দুটো আলাপ রয়েছে। প্রথমটিতে বা প্রথম পর্বে 'সাক্ষাৎকার' গল্পের সূত্রে এসেছে একজন লেখক হিসেবে তাঁর তথা যেকোনো লেখকের সাহসিকতার প্রসঙ্গ, শাসকের চোখে চোখ রেখে সত্যকথনের দায়িত্বের কথা, এসেছে একই মর্মবস্তু নিয়ে লেখা তাঁর আরো তিন বিখ্যাত গল্প 'খনন', 'পাতালে হাসপাতালে', 'পাবলিক সার্ভেন্ট'-এর কথা। বিষয়টি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এখন নির্লজ্জ মোসাহেবির কাল। এই আলাপে অন্য যে বিষয়গুলো তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলো তা হচ্ছে এই কীর্তিমান লেখকের বক্তৃতায়, সাধারণ কথাবার্তায় উইট হিউমারের যথেষ্ট পরিচয় থাকলেও তাঁর সাহিত্যে যেন তার বড়ই অভাব, এই প্রসঙ্গটি; আর তাঁর সাহিত্যে যৌনতার বিষয়টিরও প্রত্যক্ষ উল্লেখের অপ্রতুলতার বিষয়। এই গ্রন্থের পাঠকরা নিশ্চয়ই আগ্রহের সঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা পড়তে চাইবেন। আরো একটি জরুরি প্রসঙ্গ এখানে আছে, সাহিত্যের সমালোচনা। সাহিত্যতত্ত্বের রবরবার এই যুগের ভাবসাব দেখে মনে হয় লেখকের যেন আগে সাহিত্যতত্ত্ব সব গুলে খেয়ে তারপর সাহিত্য করা উচিত। আর ছাত্ররাও যদি সেই সব তত্ত্ব অনুযায়ী সাহিত্যকর্মগুলো না দেখতে পারে তাহলে তাদের ছাত্রজীবনের ষোল আনাই মিছা। রিডার রেসপন্স ওই সব ভারী ভারী ভাষায় লেখা সাহিত্যতত্ত্ব মেনেই চলতে হবে যেন। নইলে সে সাহিত্য পাঠক হিসেবে অপাঙ্‌ক্তেয়!

দ্বিতীয় পর্বে আছে আমাদের সাহিত্যে দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ কতটা সার্থকভাবে এসেছে সেই প্রসঙ্গ। আরো এসেছে আমাদের জীবনে বাংলা ভাষার গুরুত্বের প্রসঙ্গটিও। তাঁর কথা উদ্ধৃত ক'রে বললে—'পঁচানব্বই ভাগ মানুষের ভাষাই বাংলা, তাই না? তাহলে বাংলা ভাষায় জোরটা সর্বোচ্চ দেওয়ার কথা, সেটা কিন্তু নাই। আমাদের এই রাষ্ট্রের মধ্যে নাই, আমাদের উচ্চস্তরের সামাজিকতার মধ্যে নাই।'

সেলিনা হোসেনের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসগুলোর বক্তব্যের সমাজধর্মিতা সত্ত্বেও তা 'শিল্পের জায়গা রক্ষা করেই' করার বিষয়টি। সেই সাথে এই লেখক তাঁর লেখা সম্পর্কে সমালোচকের সমালোচনা যে, তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলো 'বলিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও' 'তারা পুরুষতান্ত্রিক'—এটার জবাব দিয়েছেন। প্রসঙ্গত এসেছে সমালোচকদেরও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা।

অধ্যাপক ও আমাদের দেশের প্রথম সারির নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপে আমরা পাই কাজী নজরুল ইসলামের গানের আদিসুর ও বাণী পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার কথা, তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা। আর পাই অনুবাদক নজরুল এবং ইংরেজি, ফরাসি, চিনীয়, হিস্পানি, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষায় নজরুল সাহিত্যের অনুবাদের প্রসঙ্গ। প্রশ্নোত্তরের একপর্যায়ে যদিও সাক্ষাৎকারগ্রহীতা মন্তব্য করেছেন যে—'যে বিষয়ে তিনি (নজরুল) রবীন্দ্রনাথের চেয়েও এগিয়ে, তিনি অনুবাদও করেছিলেন', প্রায় জীবনভর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ প্রচেষ্টার কথা, ভারতীয় নানান ভাষার সাহিত্য, বিদেশি সাহিত্য ও তাঁর নিজের করা নিজের সাহিত্য অনুবাদের কথা আমাদের মনে না পড়ে পারবে না, মনে পড়বে অশ্রুকুমার সিকদার রচিত 'কবির অনুবাদ' নামের সুলিখিত গ্রন্থটির কথা। আর মনে পড়বে যে তাঁর নিজের রচনার নিজের করা অনুবাদই তাঁকে নোবেল এনে দিয়েছিল।

দেশের বরেণ্য চিত্রশিল্পী ও শিক্ষক মুর্তজা বশীরের সাক্ষাৎকার নানান দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। নবম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে যাতায়াতের সুবাদে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখ নেতার নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের প্রতিকৃতি আঁকতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জওহরলাল নেহেরুর কাছ থেকে একটি বাণীসহ অটোগ্রাফ পেয়ে তাঁর সেই বাণীকে নিজের শিল্পীজীবনের ধ্রুবতারা ক'রে এগিয়ে যাওয়া। তাঁর যে বিচিত্র বর্ণিল জীবনকাহিনি এই সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে তা পাঠককে ঋদ্ধ করবে।

সাক্ষাৎকারগ্রহীতার ভাষায় 'নিরীক্ষাধর্মী সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত শাহাদুজ্জামান', যিনি নিজেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, দিয়েছেন তো বটেই। তাঁর সঙ্গে আলাপে সাধারণ প্রসঙ্গ ছাড়াও অবশ্যম্ভাবীভাবে এসেছে 'একজন কমলালেবু' নামক গ্রন্থ ঘিরে যে বিতর্ক—সেটা কি উপন্যাস না ডকুফিকশন, না অন্য কিছু সেই বিষয়টি। এসেছে অনুবাদের প্রসঙ্গ (সম্ভবত এই কারণে যে লেখক নিজেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ করেছেন), ভালো অনুবাদ খারাপ অনুবাদ এবং বিশেষ ক'রে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে বিদেশি সাহিত্য যাঁরা বাংলায় অনুবাদ করেন তাঁদের চাইতে এদেশে যাঁরা বাংলা সাহিত্য বিদেশি তথা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন তাঁদের বেশি সম্মান লাভের কৌতুককর বিষয়টি; সেই সঙ্গে আর আমাদের সাহিত্যিকদের যেনতেন প্রকারেন তাঁদের লেখা অন্য ভাষায় তরজমা করিয়ে বিদেশি আনুকূল্য বা স্বীকৃতি

লাভের হ্যাংলাপনার অস্বস্তিকর বিষয়টি।

চিত্রশিল্পী রনি আহম্মেদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি একেবারেই অন্যরকম। সেখানে যতটা না তাঁর শিল্প নিয়ে কথা হয়েছে, তার চাইতে বেশি কথা বলা হয়েছে সম্ভবত সুফিবাদ, পরাবাস্তববাদ, ধ্যান, ধর্ম, সুর, সংগীত ইত্যাদি নিয়ে। তার সঙ্গত কারণ এই যে, শিল্পী রনি আহম্মেদের কাজে এইসব বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। পাঠক এক ভিন্ন ধরনের মেজাজ পাবেন এই সাক্ষাৎকারটিতে। এই সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক দিলওয়ার হাসান অলাত এহ্সানের সঙ্গে ছিলেন।

অনুবাদ নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বহুলচর্চিত বা আলোচিত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন সাক্ষাৎকার গ্রহীতা অলাত এহ্সান—অনুবাদে স্বাধীনতা, অনুবাদকের একজন লেখক বা একটি দেশ ও ভাষা নিয়ে কাজ করা সঙ্গত বা ভালো কিনা, অনুবাদের প্রতি সাধারণ মানুষ ও একাডেমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের বেশিরভাগ অনুবাদ ইংরেজি থেকে হওয়া, অনুবাদের মান নিয়ন্ত্রণে রেগুলেটরি বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা, আমাদের অনুবাদের মান, অনুবাদ বিষয়ক পুরস্কার, কপিরাইট, অনুবাদে চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি। বাংলাদেশের কবি, প্রাবন্ধিক ও হিস্পানি ভাষার প্রখ্যাত অনুবাদক রাজু আলাউদ্দিন এবং কলকাতা নিবাসী জাপানি ভাষার অনুবাদক অধ্যাপক অভিজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকারে এসব বিষয়ে প্রাণবন্ত ও চিন্তা উদ্রেককারী আলাপন রয়েছে।

উল্লেখ্য, এখানে একমাত্র অভিজিৎ মুখার্জির সাক্ষাৎকার-ই যাকে বলে ‘প্রস্ত কোশ্চেনেয়ার’-এরই মাধ্যমে নেয়া হয়েছে, সাক্ষাৎ আলাপের মাধ্যমে নয় (তবে অবশ্যই, এবং বলাই বাহুল, এই ‘প্রস্ত কোশ্চেনেয়ার’-এ সাবেক কালের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ছিল না।) অনুমান করি দুজনের, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার গ্রহীতা ও সাক্ষাৎকার দানকারীর অবস্থানের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে এই সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে, যদিও তিনি বার দুয়েক বাংলাদেশ সফর করেছেন। এই আলাপে তাঁর প্রিয় দুই কথাসাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষ আর ভি এস নাইপল নিয়েও মনোগ্রাহী আলাপ রয়েছে।

আমাদের হাতে হাতে যখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আর মননে ঘোর অন্ধকার, চারদিকে যখন শিক্ষা-দীক্ষার এন্তার উপকরণ অথচ প্রাণে শিক্ষা-বিমুখতা আর রুপোর চাঁদি ও ক্ষমতা অর্জনে অসীম ব্যগ্রতা, প্রযুক্তির কল্যাণে অতীত সংরক্ষণের নানান উপায় যখন হাতের নাগালে অথচ

আমরা পেছনে ফিরে তাকাতে পরাঙ্মুখ, বর্তমানের অস্থির, টালটামাটাল বস্তুতান্ত্রিক জীবনযাপন নিয়ে শশব্যস্ত, তখন আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কিছু বরেণ্য ব্যক্তিত্বের যেসব সাক্ষাৎকার গ্রহণ ক'রে দুই মলাটের মধ্যে গ্রথিত করার প্রয়াস নিয়েছেন গল্পকার ও সাংবাদিক অলাত এহ্সান। তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। নানান তথ্যে, চিন্তাজাগানিয়া কথায়, অমূল্য স্মৃতিচারণে ঋদ্ধ এই সাক্ষাৎকারগুলো আমাদের এই বরেণ্য ব্যক্তিদের 'হাঁড়ির খবর' দেবার পাশাপাশি পাঠককে একটু থির হয়ে নিজেদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে ভাববার অবকাশ দেবে বলে মনে করি। এহসান ঐকান্তিক যত্নে কথোপকথনগুলোতে উল্লিখিত নানান ব্যক্তিত্ব ও বিষয় সম্পর্কে যে টীকা প্রস্তুত করেছেন, তা বিশেষ করে নব প্রজন্মের পাঠকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সেজন্য অলাত এহ্সানের জন্যে বাড়তি ধন্যবাদ।

অলমিতি বিস্তরেণ।

জি এইচ হাবীব

২৮.০৭.২০২৪

সূ চি প ত্র

বাংলাদেশের শিল্পীরা আন্তর্জাতিক মানের
কিন্তু এখনো পাশ্চাত্য প্রভাবিত
• **মুর্তজা বশীর ১৯**

গান দিয়ে মানুষকে জাগানো যায় মনে করি, ছায়ানটও তা-ই মনে করে
• **সন্‌জীদা খাতুন ৬৩**

রবীন্দ্রনাথকে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে পারেন আর নজরুলকে বলতে পারেন
সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক
• **রফিকুল ইসলাম ৮৯**

শর্তাধীন যে লেখক তাকে আমি পুরোপুরি লেখক বলে মানতে পারি না
• **হাসান আজিজুল হক ১০১**

পার্টিশনই পরবর্তীকালের যাবতীয় সন্ত্রাসগুলো ঘটিয়েছে
• **হাসান আজিজুল হক ১৪৭**

অনুবাদকদের যদি একটি সমন্বয় পরিষদ থাকত তাহলে
অনুবাদ সাহিত্য উপকৃত হতো
• **জাফর আলম ১৫৯**

সাহিত্য একজন মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে পারে
সেই জায়গা থেকে আমি দেখি
• **সেলিনা হোসেন ১৮৩**

আমাদের সাহিত্যের জগতে অনুবাদ যেমন অবহেলিত
তেমনই অবহেলিত সাহিত্য বিচার
• **অভিজিৎ মুখার্জি ১৯৫**

সাহিত্যে স্থানিকতা একটি জরুরি ব্যাপার
কিন্তু তাকে আন্তর্জাতিকতার সাথে মেলাতে হবে
• **শাহাদুজ্জামান ২৩৬**

এখন আমরা যে সভ্যতার কথা বলি
সেটি হচ্ছে 'আ হিস্ট্রি অব ট্রান্সলেশন'
• **রাজু আলাউদ্দিন ২৫৯**

নাস্তিকতা হলো সৃষ্টিকর্তাকে খোঁজার বিয়োগান্ত পথ
• **রনি আহম্মেদ ২৭৯**

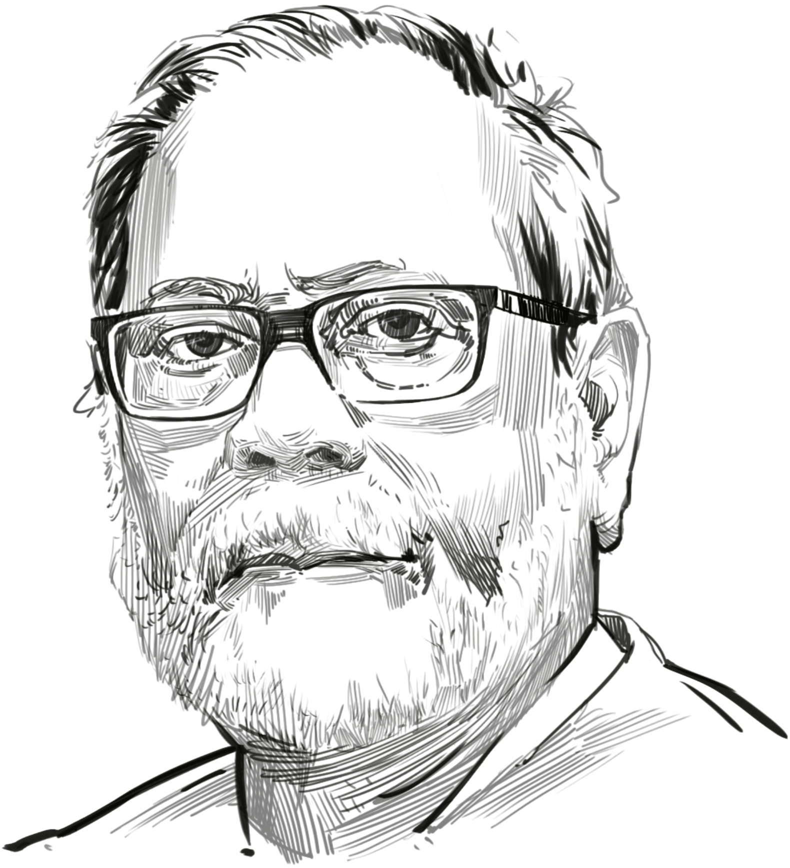

বাংলাদেশের শিল্পীরা আন্তর্জাতিক মানের কিন্তু এখনো পাশ্চাত্য প্রভাবিত

মুর্তজা বশীর

সাত দশক চিত্রকলায় সক্রিয় ছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী মুর্তজা বশীর। দেশভাগোত্তর দেশের চিত্রকলার হাল ধরা তরুণদের মধ্যে অন্যতম তিনি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন দীর্ঘদিন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম, চিত্রকর্মেও ফুটিয়ে তুলেছেন তা। তাঁর আঁকা সিরিজ—ওয়াল, রেক, উইংস, এপিটাফ ফর দ্য মার্টার, ওমেন, কালেমা তৈয়্যবা, কোলাজ ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু তিনি সেই জনপ্রিয়তায় আটকে থাকেননি, ক্রমাগত বদলেছেন বিষয়বস্তু ও প্রকরণ। ছাপচিত্র, জলরং, তেলরং, মিশ্রমাধ্যমে কাজ করেছেন তিনি। চিত্রকলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। চিন্তা ও প্রকরণে শক্তিশালী চিত্রণ, রঙের বৈচিত্র্য ও সমাজমুখিতা মুর্তজা বশীরের চিত্রকে করেছে অনন্য। খ্যাতিমান পিতা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দ্যুতির বাইরেও তিনি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তিন দশক শিক্ষকতা করেছেন মুর্তজা বশীর। তিনি একজন লেখকও। লিখেছেন গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা। তাঁর ৮৫তম জন্মদিনের আগে, ২০১৭ সালের আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের একদিন, তাঁর ফার্মগেটের বাসায় দীর্ঘ আলাপ হয়। কথা ছিলো পরে আবারও আলাপ হবে। কিন্তু তাঁর ব্যস্ততা, শারীরিক অসুস্থতা, স্ত্রীবিয়োগ, করোনা এবং শেষ পর্যন্ত ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট প্রয়াণের মধ্য দিয়ে সেই সুযোগ শেষ হয়ে যায়। এই সাক্ষাৎকারে তিনি রাজনীতি, দেশ, চিত্র-ভাবনা, স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন করেছেন।

■ ***অলাত এহ্সান :*** *আমার খুব মনে পড়ছে, ২০০৩-০৪ সালে, আমি তখন উচ্চ মাধ্যমিক পেরুনো ছাত্র, সেই সময় এক পরিচিতজনের কাছ থেকে আপনার সদ্য শেষ হওয়া একটি আর্ট এক্সিবিশনের ব্রুশিয়ার পেয়েছিলাম। সেখানে প্রদর্শনীর অনেক ছবির প্রিন্ট ছিলো। একটি ছবি আমার কিশোর মনে বেশ দাগ কেটে যায়। দৃশ্যটা হচ্ছে, গলা কাটা দুটো মোরগ মাটিতে পড়ে আছে, পাশেই রক্তমাখা ছুরি। ছবিটির নাম ছিলো 'স্যাক্রিফাইস'। তেল রঙে আঁকা ছবি। আমার কাছে মনে হয়েছে—এই মোরগ, ছুরি, জবাই সবই আমার পরিচিত, কিন্তু এই জবাইয়ের ভেতরে যে আরেকটা অর্থ, গূঢ় ভাবনা আছে, তা এইভাবে আমি ভাবিনি।*

মুর্তজা বশীর : আচ্ছা, কেমন?

■ *মোরগ দুটো তার জীবন দিচ্ছে, আবার চাকুটা ব্যবহার করার পর*

অকেজো পড়ে থাকছে, স্যাক্রিফাইসটা এরা দু'জন করছে, করছি না কেবল আমরা। আমরা মাংস খাওয়ার জন্য মোরগের আত্মদান, চাকুটাকে নিঃস্বার্থ হতে বাধ্য করছি। মানে যাকে জবাই করা হচ্ছে সে স্যাক্রিফাইস করছে, যা দ্বারা জবাই করা হচ্ছে সেও স্যাক্রিফাইস করছে। তাহলে এই স্যাক্রিফাইসের মূল্য কোথায়? মানে অন্য কেউ তাদের স্যাক্রিফাইসের সুবিধা নিচ্ছে। তাই না?

মুর্তজা বশীর : তা তো ঠিকই।

■ *এটি আসলে সমাজের ভেতরে দেখার বিষয়টাকে সামনে এনেছে। বলতে গেলে এই দেখার ভেতরে আপনার রাজনৈতিক দর্শনও কাজ করে। আপনি অবিভক্ত ভারতে ছাত্র ফেডারেশন করেছেন, জেলে গিয়েছেন। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক দিন কমিউনিস্ট পার্টির পার্টিজান হিসেবে সক্রিয় ছিলেন, পার্টি ছাড়ার পরও আপনার জীবনদর্শন হিসেবে তার চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এ কারণে বোধ হয় কিশোর বয়সেই আপনার ছবির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছিলাম। আপনি নন-ফিগার বা অ্যাবস্ট্রাক্ট খুব কম এঁকেছেন। ফিগারই অধিকাংশ। তাতে আমাদের দেখা ফিগারের ভেতর আপনি চিন্তা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন।*

মুর্তজা বশীর : জি।

■ *সেদিক দিয়ে আপনার বইটিতে (আমার জীবন ও অন্যান্য) বললেন, আমি নন-ফিগার থেকে ফিগারেটিভে ফিরে এলাম। এই যে ফিগারে ফিরে আসা, এটি কেন ছিলো?*

মুর্তজা বশীর : ব্যাপার হলো কী, যেকোনো শিল্পীকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় যে, তাঁর ছবি আঁকার প্রেরণা কবে থেকে? এই আকাঙ্ক্ষা কবে থেকে? সবাই এক বাক্যে বলবে যে, তাঁদের ছোটবেলা থেকে শখ ছিলো তাঁরা ছবি আঁকবেন, আর্টিস্ট হবেন। (আপনার তো তা কখনোই ছিলো না—*এহ্সান*)। না, আমার তা কখনোই ছিলো না, সেইরকম আকাঙ্ক্ষা ছিলো না। আমি আর্টিস্ট হব, এরকম কোনোদিন বাসনা ছিলো না। তখন ছবি দেখতে আমার ভালোলাগত। আমার পিতার লাইব্রেরিতে আমি যখন ঢুকতাম, পিতার অবর্তমানে, ওখানে ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী, মডার্ন রিভিউ, প্রবাসী ইত্যাদি

পত্রিকায় তখনকার বাঙালি যাঁরা প্রধান শিল্পী, তাঁদের রঙিন ছবি ছাপা হতো। দেখতাম। পরবর্তীকালে সেই সময় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়—পিকাসো, মাতিস, ভ্যান গগ, পল গগাঁ—তাঁদের ছবি দেখেছি। পরবর্তীতে, ১৯৫৬ সালে আমার বাবা যখন আমাকে পড়তে পাঠালেন (ইতালিতে গেলেন—*এহ্সান*)। হ্যাঁ। তখন এইসব ছবি দেখার মধ্যে আকর্ষণ ছিলো, কিন্তু চমক ছিলো না। কারণ এগুলো তো ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। পিকাসোর ছবি আমার কাছে আর তেমন চমক লাগেনি। কারণ ছোটবেলা থেকেই পিকাসোর কাজ দেখেছি। ওটা (বাড়িতে দেখা ছবিকে ইঙ্গিত করে) ছিলো রি-প্রোডাকশন, এটি প্রোডাকশন।

সেই সময়, ব্রিটিশ আমলে, তখন দেশভাগ হয়নি, আমাদের পরিবারে একটি অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ ছিলো। তখন মুসলিম লীগের হয়ে অনেকেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আমার পিতা, তিনি কোনোদিন রাজনীতি করেননি এবং মুসলিম লীগের কোনো ঘোর সমর্থকও ছিলেন না। বেশিরভাগ মুসলিমরা, ৯৯ ভাগ, পাকিস্তান চায়; কিন্তু আমার বাবার ওই ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিলো না—পাকিস্তান হবে কি হবে না। তো, সেই সময়, ১৯৪৬ সালে দেশভাগের আগে, আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি, বগুড়ায় থাকি। আমার পিতা ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিটায়ার করার পরে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের প্রিন্সিপাল। সেই সময় আমরাও বগুড়ায় ছিলাম। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপনে, মানে অত প্রকাশ্য ছিলো না। তাদের যে ছাত্র সংগঠন, তার নাম ছিলো ছাত্র ফেডারেশন। সেটির সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত হই এবং ছাত্র ফেডারেশনের একজন সদস্য হই।

তখন ছাত্র ফেডারেশনের অফিস, কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে যাতায়াত করতাম। এবং এই ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার ফলে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের নাম শুনি। আমার বাসনা হলো যে, আমি এদের পোর্ট্রেট করব। কিন্তু আমি তো ছবি আঁকা জানি না, কী করে আঁকব! তো, আমি রাস্তা দিয়ে যখন যেতাম, তখন তো আর ডিজিটাল ব্যানার হয়নি, রাস্তার মোড়ে সাইনবোর্ড পেইন্টাররা খোপ কেটে কেটে ওটাকে ব্লক করে বড় করত। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম আর বাড়িতে এসে অনুশীলন করতাম। এরপরে আমি বাইশ বাই ত্রিশ ইঞ্চি চারটি ছবি এঁকে ছাত্র ফেডারেশন অফিসে নিয়ে যাই। তারা ওইটা পার্টি অফিসে দেয়। তখন

সবে দেশভাগ হয়েছে, ১৪ আগস্ট ১৯৪৭, তার ১৫ দিন পর কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক নেতা ভবানী সেন, উনি বগুড়াতে এলেন। তিনি আমার সাথে দেখা করতে চাইলেন। আমাকে বললেন, খোকা, এই ছবি-টবি তুমি এঁকেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন আমার অটোগ্রাফ জমাবার শখ ছিলো। (হ্যাঁ। এমনকি আপনার আঁকা ছবি পাঠিয়ে জওহরলাল নেহরুর অটোগ্রাফ দেয়া ছবি সংগ্রহ করেছিলেন—*এহ্সান*)। হ্যাঁ। তখন উনি অটোগ্রাফে যে কথাগুলো লিখেছিলেন সেই কথাগুলো আজ পর্যন্ত, তখন আমার বয়স ছিলো পনেরো, আজকে আমার পঁচাশি এবং ওটাই আমার জীবনের মোটো হয়ে গেল।

■ *আপনার বিভিন্ন সময়ের লেখার মধ্যে কিন্তু তা ঊর্ধ্ব কমার মধ্যে বলে দিয়েছেন।*

মুর্তজা বশীর : হ্যাঁ, যে, 'আর্টিস্টের কাজ হলো শোষিত জনগণের অভাব ও দুঃখ-দুর্দশাকে চিত্রের ভিতর দিয়ে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা, যাতে সমাজে সে আর্ট নবজীবন সৃষ্টি করতে পারে।' এটি আমার হৃদয়ে একেবারে, যেমন কাঁচা সিমেন্টের ওপর দিয়ে একটি চাকা চলে গেলে যে দাগ হয় তা কিন্তু আর মোছে না, আমার হৃদয়ে তেমনভাবে গেঁথে গেল। পরবর্তীকালে পার্টি আমাকে বলল যে, তুমি আর্ট স্কুলে ভর্তি হও। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম (আমাদের সময় ম্যাট্রিক ছিলো)। ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক দিয়ে ঢাকায় এলাম। তো আমার বাবা চাইলেন আমি আলীগড়ে (ভারতের উত্তর প্রদেশের 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' ইঙ্গিত করে) পড়তে যাই। এটি তখন মুসলিম আভিজাত্য ছিলো। আমার বড়ভাই মুহম্মদ শফীয়ূল্ল্যা, উনি আলীগড়ে পড়ালেখা করেছেন। কিন্তু আমার তো উদ্দেশ্য হলো আর্ট পড়া না, পার্টি। আমি যখন বললাম, আমার (আর্ট পড়ার) বাসনা, তখন আমার পিতা বললেন যে, তাহলে তুমি শান্তিনিকেতনে যাও। আমার পিতা রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। বিশ্বভারতী যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ আমার পিতাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, বিশ্বভারতীর কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার পিতার চিঠিপত্র আদান-প্রদান ছিলো। কিন্তু আমার তো ছবি আঁকাটা মূল উদ্দেশ্য না, তাই আমি শান্তিনিকেতনে যেতে চাইলাম না। আমি ঢাকাতেই থাকতে চাইলাম। ঢাকাতে পার্টির কার্যক্রমে যুক্ত হব, এই ভাবনা।

এখন যে অবস্থা, তেমন ছিলো না। তখনকার সময়ে শিল্পীরা ছিলো ভাবজগতের বাসিন্দা, সমাজের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছিলো না। তখন ওটার নাম ছিলো গভমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট, আমি সেখানে ভর্তি হলাম। (১৯৪৯ সালে, দ্বিতীয় ব্যাচে—*এহ্সান*)। হ্যাঁ। আমার পিতা, উনি বাধা দিয়েছিলেন। এটি একটি 'ইয়ে' আছে, লোকজন যেটি বলে, বলে থাকে, যেহেতু উনি ধর্মভীরু লোক ছিলেন, সেই জন্য তিনি বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাকচুয়্যালি তা না। উনি যেটি বলেছিলেন, সেটি আমার লেখার মধ্যে আমি বলেছি।

■ *হ্যাঁ বলেছেন, তিনি (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) বলছেন যে, দেখ আমি প্যারিস ঘুরে দেখেছি শিল্পীরা খুব কষ্টে-শিষ্টে, অনাহারে-অর্ধাহারে জীবনযাপন করেন, আমি চাই না আমার সন্তান হয়ে তুমিও সেই কষ্ট কর।*

মুর্তজা বশীর : হ্যাঁ। সন্তানকে ওইরকম কষ্টের জীবনযাপন করতে দিতে চাননি। তারপরেও আমার বাবা আমাকে টাকা দিলেন ভর্তি হওয়ার জন্য। মজার ব্যাপার হলো যে, উনি লাইব্রেরিতে আমাকে নিয়ে গেলেন। ওনার লাইব্রেরিতে ছোট্ট একটি মেহগনি কাঠের আলমারি ছিলো। সেটির ভেতরে তাঁর মূল্যবান বইপত্র, কাগজপত্র রাখেন। ওটা চাবি মারা থাকত। ওইটা খুলে ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামের দুই খণ্ড ক্যাটালগ—যেখানে রাফায়েল, দ্য ভিঞ্চি, ইংলে, বোতেচেল্লি—তাঁদের কাজ-টাজ ছিলো।

■ *এটি ফ্রান্সে ভারতীয় ছাত্ররা তাঁকে...*

মুর্তজা বশীর : তাঁকে (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে) উপহার দিয়েছিলো। তাতে বোঝা যায় উনি আর্ট লাভার ছিলেন। কারণ উনি প্যারিসে ডক্টরেট করার পর, যার বিষয়বস্তু ছিলো চর্যাপদ, যার ফলে উনাকে চর্যাপদের ওপর বই দেয়ার কথা, কিংবা ভালো কলম দেয়ার কথা, তাঁকে এটি (ল্যুভর-এর ক্যাটালগ ইঙ্গিত করে) দেয়ার মানে হলো, তিনি শিল্পরসিক ছিলেন, শিল্পপ্রেমী ছিলেন; যার জন্য তাঁর যোগ্য উপহার হিসেবে একে মনে করেছেন। ওই বই দুটো অনেকটা নিষিদ্ধ ফলের মতো ছিলো। কারণ ওর মধ্যে কিছু বিবস্ত্রা নারীর ছবি, যা ওইরকম বয়সে একটি কিউরিসিটি, কৌতূহল হবে। কিন্তু

আমার পিতা কোনোরকম দ্বিধা না করে ওই বই দুটো আমার হাতে দিলেন, এবং বললেন যে, এ দুটো বই এত দিন আমার কাছে ছিলো, আজ থেকে তোমার। এটি তাঁর অন্যান্য সন্তান, যারা কেউ বিবাহিত কেউ অবিবাহিত, তাদের দিলেন না। কারণ তিনি এইটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, এই বিবস্ত্রা নারীরা আমার কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক হবে, যা অন্যদের ভেতরে একটি কামভাব জাগ্রত করতে পারে। এই যে ডিফারেন্স বিটুইন ন্যুড অ্যান্ড ন্যাকেড, এটি আমি লিখেছি। তো যাই হোক, আমি ওই ছাত্র ফেডারেশন করি। পরবর্তীকালে ঢাকাতেই থেকে যাই।

বাংলাদেশের প্রকৃতি এতই সুন্দর, যেকোনো শিল্পী জলরঙে প্রকৃতির দৃশ্যই বেশি আঁকে, কিন্তু আমি প্রকৃতির দৃশ্য খুব আঁকিনি। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে মানুষই হচ্ছে সুপ্রিম। অতএব প্রকৃতির ছবিতে প্রকৃতিই প্রধান হয়, মানুষ খুব ছোট হয়। বাবা যখন আমাকে ইতালিতে পাঠালেন, ফ্লোরেন্সের প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর, মানে একেবারে স্বপ্নের মতো। কিন্তু আমি ওইগুলো না এঁকে ওই যে সাধারণ মানুষ, তাদের দৈনন্দিন জীবন, চলমান জীবন, ওই যে ভবানী সেনের যে কথা, ওইটাই আমার মোটো ছিলো। যার জন্য আমি এখনো যে ছবি আঁকছি, ছবি আঁকার জন্য ছবি আঁকা, আর্ট ফর আর্ট সেক, কখনো করতে পারছি না। আমি করছি সমাজের প্রতি একটি দায়বদ্ধতা থেকে।

■ *হ্যাঁ, যে ছবির কথাটি আমি প্রথমেই বলেছিলাম, দুটো মোরগ জবাই হয়ে আছে, তার ভেতরে দেখার একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। সেখান থেকেই করছিলেন—*

মুর্তজা বশীর : জি।

■ *তবে আপনার 'আমার জীবন ও অন্যান্য' বইটি পড়তে গিয়ে একটি বিষয়ে তন্ময় হয়ে যাচ্ছিলাম। সেটি হচ্ছে, ব্রিটিশ কাউন্সিলের পাশে একটি হলে আপনার পিতা প্রভোস্ট হওয়ার পর আপনারা যে বাসায় থাকছিলেন, সেখানে দেখছি আপনি কলাবাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, আর কলাবাগানের ওপাশেই একটি ঘর। ঘরের ভেতরে বিগতযৌবনা এক বাইজি ছিলেন।*